bwged

জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন ২০২৩ (কপ-২৮)

কয়লা ও গ্যাসসহ জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করো

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বিশ্ব নিশ্চিত করো

বিগত বছরগুলোর মতো এ বছরও জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কর্মকাঠামো সনদ (UNFCCC)-এর উদ্যোগে আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরে 'কপ-২৮' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ সম্মেলনের প্রকৃত নাম 'জলবায়ু সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রীয় পক্ষসমূহের সম্মেলন' (Conference of Parties) বা 'কপ' হলেও সাধারণভাবে 'জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন' নামে পরিচিত। ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনে জাতিসংঘ জলবায়ু সনদ গৃহীত হবার পর ১৯৯৫ সালের মার্চে জার্মানির বার্লিন শহরে প্রথম সম্মেলন (COP) অনুষ্ঠিত হয়। দুবাই সম্মেলনটি ২৮তম জলবায়ু সম্মেলন বিধায় একে 'কপ-২৮' বলা হয়।

পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান, বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর প্রধান, বিজ্ঞানী, জলবায়ু-অধিকারকর্মী, সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এ সম্মেলনে মিলিত হন। কিন্তু সম্মেলনে কতটুকু কার্যকর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সে প্রশ্ন রয়েই গেছে। বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের কারণে শক্ত ও ঋজু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। আবার, আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকায় অধিকাংশ সিদ্ধান্তই যথাসময়ে ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হয় না। এ কারণেই জলবায়ু-কর্মীগণ দাবি তোলেন, 'বকবক করো না, কাজ করো' কিংবা 'ঐচ্ছিক সমঝোতা নয়, আইনগত চুক্তি চাই'।

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী অতিরিক্ত গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনকারী দেশ ও খাতসমূহ। শিল্প বিপ্লবের পর ঔপনিবেশিক দেশগুলো ব্যাপকভাবে যান্ত্রিক উৎপাদনের দিকে ধাবিত হয় যা অতিরিক্ত কার্বন নির্গমনের নতুন ইতিহাস রচনা করে। ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবী তিন লাখ কোটি টন কার্বন বায়ুমণ্ডলে গ্রহণ করতে পারবে। ইতোমধ্যে দুই লাখ ৫০ হাজার টন কার্বন নির্গমন করা হয়ে গেছে। অর্থাৎ পৃথিবীর সহনসীমার ৮৩ শতাংশই ব্যবহৃত হয়ে গেছে এবং মাত্র ১৭ শতাংশ বাকি আছে। যেভাবেই হোক, আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে আর মাত্র ৫০ হাজার কোটি টন কার্বন নির্গমন করা নিরাপদ।

শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ঐতিহাসিক কার্বন নির্গমন বিবেচনায় নিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন ও জাপান পৃথিবীর সবথেকে বেশি ঐতিহাসিক নির্গমনকারী দেশ। এমন ৪৩টি নির্গমনকারী দেশকে সংযুক্তি-১ভূক্ত দেশ বলা হয়। এর মধ্যে ২৪টি শিল্পোন্নত দেশ (ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ) সংযুক্তি-২ভূক্ত। জাতিসংঘ জলবায়ু সনদ অনুযায়ী এসব দেশ কার্বন নির্গমন কমানো (mitigation), স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অভিযোজন (adaptation) ও প্রশমনের (mitigation) জন্য অর্থায়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য দায়বদ্ধ। তবে, ইদানিং কিছু অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশের বার্ষিক নির্গমন ঐতিহাসিক নির্গমনও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। চীন বর্তমান পৃথিবীর সবথেকে বড় নির্গমনকারী দেশ। এর পরই রয়েছে ভারত (৩য়), রাশিয়া (৪র্থ), ব্রাজিল (৫ম), ইন্দোনেশিয়া (৬ষ্ঠ), ইরান (৮ম), মেক্সিকো (৯ম), সৌদি আরব (১০ম) ও দক্ষিণ কোরিয়া (১৩শ)।

২০১৫ সালে সম্পাদিত প্যারিস চুক্তি অনুসারে ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার শিল্পবিপ্লবের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রত্যেক দেশ প্যারিস চুক্তি অনুসারে কার্বন নির্গমন কমানোর জন্য 'জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অঙ্গীকার' (Nationally Determined Contribution) বা 'এনডিসি' পেশ করেছে। তবে, জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তসরকারি প্যানেল (Intergovernmental Panel on Climate Change) বা আইপিসিসি'র গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এনডিসি অনুসারে নির্গমন কমালে ২০৫০ সাল নাগাদ তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ৩.৬ ডিগ্রি পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। সুতরাং, বর্ধিত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী এনডিসি প্রণয়ন করে শিল্পোন্নত দেশগুলোর নির্গমন ব্যাপক হারে কমাতে হবে।

বর্তমানে (২০২২) বার্ষিক বৈশ্বিক নির্গমনের পরিমাণ পাঁচ হাজার ৬০ কোটি টন যার মধ্যে জ্বালানি খাত থেকে এক হাজার ৫২০ কোটি টন, নির্মাণ খাত থেকে ১ হাজার ২৩০ কোটি টন ও আবাসন খাত থেকে ৫৫৭ কোটি টন নির্গমন হয়। জ্বালানি খাত (বিদ্যুৎ, পরিবহন ও শিল্প) থেকেই সবথেকে বেশি পরিমাণ কার্বন নির্গমন হয় যার পরিমাণ মোট নির্গমনের ৩০ শতাংশ। জ্বালানি খাতের মোট নির্গমনের ৩৯ শতাংশ কয়লা, ৩৪ শতাংশ পেট্রোলিয়াম ও ২১ শতাংশ জীবাশ্ম গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে ঘটে থাকে। সুতরাং, কয়লা, জীবাশ্ম গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার বন্ধ করে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রবর্তন করাই ধরিত্রী বাঁচানোর যথাযথ উপায়।

বিশ্বব্যাপী আন্দোলন-সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে ২০২২ সালের 'কপ-২৭' সম্মেলনে ২০৩০ সাল নাগাদ কয়লার ব্যবহার বন্ধ করায় প্রায় সব দেশ একমত হয়। চূড়ান্ত ঘোষণা স্বাক্ষরের পূর্ব মুহূর্তে ভারত ও চীনের অভব্য আচরণের কারণে কয়লা ব্যবহার 'বন্ধ করা'র বদলে 'কমিয়ে আনা'র কথা লেখা হয়। এ বছরের জলবায়ু সম্মেলনে কয়লা ও জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলো দর কষাকষির ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশ (Least Developed Countries) বা এলডিসি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর (জি-৭৭) নেতৃত্বের ক্ষমতা ব্যবহার করে থাকে। এ ধরনের জোট ব্যবহার করে যাতে তারা নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধার করতে না পারে সেজন্য 'জলবায়ু-বিপদাপন্ন ফোরাম' (Climate Vulnerable Forum) বা সিভিএফ-এর সক্ষমতা ও রাজনৈতিক শক্তি বাড়াতে হবে।

এনডিসি অনুসারে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও কার্বন নির্গমন কমানোয় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০২১ সালের আগস্টে পেশকৃত এনডিসিতে বাংলাদেশ ২০৩০ সাল নাগাদ ২০১২ সালের তুলনায় কার্বন নির্গমন ৬.৭ শতাংশ কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এনডিসি অনুসারে, ২০৩০ সাল নাগাদ গতানুগতিক উন্নয়নের ফলে নির্গমনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪০ কোটি ৯৪ লাখ টন। আন্তর্জাতিক সহায়তা পাওয়া গেলে নির্গমন ৮ কোটি ৯৫ লাখ টন (২১.৯%) কমানো হবে। অপরদিকে, কোনো সহায়তা না পাওয়া গেলে সরকার নিজ খরচে ২ কোটি ৭৬ লাখ টন (৬.৭%) নির্গমন কমাবে। বাংলাদেশে জলবায়ু-বান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতি মোতাবেক অর্থায়ন ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে শিল্পোন্নত দেশগুলো দায়বদ্ধ। আমরা সেই দায়বদ্ধতা বাস্তবে দেখতে চাই।

আন্তর্জাতিক সহায়তার জন্য অপেক্ষা না করে আমাদের দেশেরও কার্বন নির্গমন কমানো দরকার। কারণ, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তার প্রথম শিকার হবে বাংলাদেশের মতো উপকূলীয় উন্নয়নশীল দেশগুলো। এছাড়া দুষণকারী শিল্প ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সবার আগে স্থানীয় পরিবেশই বসবাস-অযোগ্য হয়ে যায়। জাতীয় নির্গমন কমানোর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক

এসব তো ভবিষ্যৎ দুর্যোগ ও ঝুঁকি মোকাবেলার কথা। এদিকে, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন ও বন্যা তো থেমে নেই! ইতোমধ্যে জলবায়ুর যে ক্ষতি হয়ে গেছে তার অভিঘাতে এ ধরনের আকস্মিক (sudden on-set) দুর্যোগের সংখ্যা, ঘনত্ব ও ভয়াবহতা - সবই বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৮০'র দশকে বঙ্গোপসাগরে গড়ে আটটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হতো। এখন বছরে গড়ে ১৪-১৭টি নিম্নচাপ তৈরি হয় যার চারটি ঘূর্ণিঝড়ের রূপ ধারণ করে। ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে উপকূলে আঘাত হানে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। এসব দুর্যোগে পরিবারের আয়ক্ষম সদস্য নিহত বা আহত হলে তা দরিদ্রদের জন্য অশনিসঙ্কেত বয়ে আনে। এছাড়া গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি, ফসলের ক্ষেত ও মাছের খামারের ক্ষতি হলে এসব পরিবার অপরিসীম দারিদ্র্যে পতিত হয়।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঘটনা না ঘটলেও, শুধুমাত্র নিম্নচাপই উপকূলীয় জেলেদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের সমান। পরিবারের সবশেষ সম্বল বন্ধক রেখে কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে তাঁরা সাগরে মাছ ধরতে যান। মাঝপথে নিম্নচাপের সতর্কসঙ্কেত পেলে জাল না ফেলে খালি হাতেই ফিরে আসতে হয়। ঋণের জালে নিজেরা আটকা পড়ে ঘরবাড়ি হারিয়ে বাধ্যতামূলক উদ্বাস্তুতে পরিণত হন।

লবণাক্ততা বৃদ্ধি, খরা, অতিবৃষ্টি, সমুদ্রস্ফীতি, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, নির্বনায়নের মতো ধীরগতির (slow on-set) অভিঘাতগুলোর প্রভাব আরো মারাত্মক। এসব প্রতিক্রিয়াগুলো সাদা চোখে দেখা যায় না, তাই এগুলোর উপর ভালোভাবে গুরুত্বারোপ করা হয় না। উদাহরণ : প্রতি দশ বছর পরপর আদমশুমারিতে দেশের জনসংখ্যা নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিগত তিন দশক ধরে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বরগুনা জেলার জনসংখ্যা প্রায় দেড় শতাংশ হারে কমে যাচ্ছে। একই ধরনের ঘটনা ঘটছে ঝুঁকিপূর্ণ নোয়াখালী, লক্ষীপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধার মতো জেলাগুলোতেও। ঘটনাটি খালি চোখে দেখা যায় না কিন্তু

এ অঞ্চলের শ্রমশক্তি কমে যাচ্ছে যা বার্ষিক উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তসরকারি প্যানেল বা আইপিসিসি'র ৬ষ্ঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুসারে আবহাওয়ার অনিয়মিত পরিবর্তন ও চরম ভাবাপন্নতার ফলে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের মত উষ্ণমণ্ডলীয় দেশগুলোর দানাশস্যের (ধান-গম) উৎপাদন ১২ থেকে ৩২ শতাংশ কমে যেতে পারে। একই সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গিয়ে উপকূলীয় নিচু এলাকাগুলো তলিয়ে যেতে পারে যা বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭ শতাংশ। এছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পতঙ্গবাহী রোগব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে দেশের উত্তরাঞ্চলে খরার আওতাভুক্ত এলাকা সম্প্রসারিত হয়ে ভূগর্ভস্থ পানিসংকট ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নোনা-কবলিত এলাকার আয়তন ক্রমশ বাড়ছে। এর ফলে বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা থেকে শুরু করে বরগুনা ও নোয়াখালী অঞ্চলেও স্বাদুপানির সংকট দেখা দিয়েছে। মাটির লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় চাষের আওতাভুক্ত জমি কমে যাচ্ছে। ফসলের উৎপাদন কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে দারিদ্র্য ও খাদ্য সংকট। ফলশ্রুতিতে বিপদাপন্ন এলাকাগুলো থেকে মানুষ বাস্তুচ্যুতির শিকার হচ্ছে। আশঙ্কা করা হয় যে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে দুই থেকে তিন কোটি মানুষ জলবায়ু-উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। এই বিপুলসংখ্যক মানুষের জন্য সম্মানজনক জীবিকা ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দুরূহ।

এইসব বিদ্যমান জলবায়ু-দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য বহু বছর ধরে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকার ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ থেকে ক্ষতি ও অপচয় (Loss & Damage) তহবিল গঠনের দাবি জানিয়ে আসছেন। গত বছর মিশরে অনুষ্ঠিত ২৭তম সম্মেলনে (কপ-২৭) একটি এলএনডি (L&D) তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু শিল্পোন্নত দেশগুলো এ তহবিল থেকেও বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে তারা বেসরকারি বিনিয়োগ, বহুপাক্ষিক ব্যাংকের ঋণ, বীমা, গ্যারান্টি ও অনুদান মিশ্রিত তহবিল (blended finance) গঠন করতে চায় যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থবিরোধী। এ তহবিলের ব্যবস্থাপক হিশেবে বিশ্বব্যাংককে নিয়োগ দেয়াও একটি আত্মঘাতী প্রস্তাব, কারণ বহু দেশের জনসাধারণ বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্ত। এছাড়া এ তহবিলে চাঁদা দেয়ার জন্য চীনের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ হিশেবে চীন এ ধরনের বাধ্যতামূলক চাঁদা দিতে রাজি নয়।

এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও বর্তমান নির্গমন হিসাব করেই দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে এ পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টন গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন করা হয়েছে। এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪২ হাজার ১৯০ কোটি টন, রাশিয়া ১১ হাজার ৭৫০ কোটি টন, যুক্তরাজ্য সাত হাজার ৮৫০ কোটি টন, জাপান ছয় হাজার ৬৭০ কোটি টন ও ফ্রান্স ৩ হাজার ৯১০ কোটি টন গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন করেছে। অন্যদিকে, চীনের বর্তমান বার্ষিক নির্গমন ১,৫৬৮.৪৬ কোটি টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬০১.৭৪ কোটি টন, ভারতের ৩৯৪.৩৩ কোটি টন, রাশিয়ার ২৯৭.৯৮ কোটি টন ও ব্রাজিলের ১৩১.০৫ কোটি টন। তবে, উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু নির্গমনের পরিমাণ উন্নত দেশের তুলনায় অনেক কম।

অধিক জনসংখ্যার কারণেই এসব জাতীয় নির্গমনের পরিমাণ বেশি হয়। ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ ছিলো যথাক্রমে ২১.৯৮ ও ১৭.৯ টন। অপরদিকে, চীনের মাথাপিছু নির্গমনের পরিমাণ ছিলো ১০.৭ টন, ব্রাজিলের ৬ টন, ভারতের ২.৮ টন, নেপালের ১.৮ টন ও বাংলাদেশের মাত্র ১.৬ টন। তাই, নির্গমনের ন্যায্য ভাগাভাগির (Fair Share)-এর প্রশ্নটি সামনে এসেছে। ভোগ ও নির্গমনের এই বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে দ্রুততর সময়ে নির্গমন কমানোর জন্য ফেয়ার শেয়ার নীতি অনুসারে শিল্পোন্নত দেশের পাশাপাশি অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশগুলোকেও দায়িত্ব নিতে হবে।

কিন্তু অর্থায়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে 'ফেয়ার শেয়ার' নীতি পুরোপুরি অবজ্ঞা করা হয়েছে। অভিযোজন ও প্রশমনে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করার জন্য ২০১০ সালে গঠিত সবুজ জলবায়ু জলবায়ু তহবিল (Green Climate Fund) বা জিসিএফ-এ শিল্পোন্নত দেশগুলো ২০২০ সালের মধ্যে দশ হাজার কোটি ডলার অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও ২০২২ সাল পর্যন্ত মাত্র এক হাজার ৩০ কোটি ডলার দেয়ার ঘোষণা করা হয়েছে এবং ৯৩০ কোটি ডলার দেয়া হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অভিযোজন ও প্রশমনে জিসিএফ থেকে এক হাজার ১৪০ কোটি ডলার প্রদানের চুক্তি করা হয়েছে। কিন্তু এ তহবিলের একটি বড় অংশ চলে গেছে বিশ্বব্যাংক ও এডিবি'র মতো আন্তর্জাতিক

অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে। এছাড়া বেসরকারি খাত থেকে অর্থায়নের কারণে জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রম বাণিজ্য ও মুনাফার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। তাই ব্যক্তিখাত নয়, বরং রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ দিয়েই জিসিএফ-এ অর্থায়ন করতে হবে।

জিসিএফ থেকে অর্থায়নের ক্ষেত্রেও রয়েছে চরম বৈষম্য। জিসিএফ থেকে প্রশমন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৯১ শতাংশ অর্থ। এর বিপরীতে অভিযোজন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ যা জলবায়ু-বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতি চরম অবজ্ঞার নামান্তর। এছাড়া, বাংলাদেশের মতো চরম বিপদাপন্ন দেশে এ পর্যন্ত বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ৩৭.৪ কোটি ডলার। অথচ, জিসিএফ-এর উদ্দেশ্যই ছিলো বিপদাপন্ন দেশগুলোর জলবায়ু ঝুঁকি কমানোয় অর্থায়ন ব্যবস্থা করা। বর্তমান অর্থায়ন কাঠামো জিসিএফ-এর মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

আমাদের দাবি

১. ২০৩০ সালের মধ্যে শিল্পোন্নত দেশগুলোর কার্বন নির্গমন ২০০৫ সালের তুলনায় কমপক্ষে ৩০ শতাংশ কমাতে হবে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে শূন্য নির্গমন নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে 'নেট জিরো' নয়, প্রকৃত 'শূন্য নির্গমন' চাই।

২. উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশ নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎকেন্দ্র ও শিল্পখাতে কয়লার ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে কার্বন ধারণ ও সংরক্ষণ (Carbon Capture and Storage) বা সিসিএস প্রযুক্তি ব্যবহারের দোহাই দেয়া যাবে না।

৩. জীবাশ্ম গ্যাস (এলএনজিসহ) ও পেট্রোলিয়ামে অর্থায়ন ও প্রযুক্তি সরবরাহ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। রূপান্তরকালীন জ্বালানির নামে এলএনজি'র সম্প্রসারণ বন্ধ করতে হবে।

৪. স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিপদাপন্ন জনসাধারণের জলবায়ু অভিযোজনের জন্য সরাসরি অর্থায়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে হবে।

৫. এলএনডি তহবিলে ঋণ কিংবা বেসরকারি বিনিয়োগ নয়, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এলএনডি তহবিলে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভূক্তি নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬. বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দ্রুত ও ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তরের জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে এবং সহজ অর্থায়নের মধ্য দিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হবে।

৭. শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জিসিএফ-এ প্রতি বছর ১০ হাজার কোটি ডলার দিতে হবে যাতে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জলবায়ু-ঝুঁকি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত হয়।

৮. জিসিএফ থেকে চরম বিপদাপন্ন স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অভিযোজনে অধিকতর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড় এসব দেশে জ্বালানি খাতে ন্যায্য রূপান্তরে অর্থায়ন করতে হবে।

৯. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাধ্যতামূলক বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে 'জলবায়ু উদ্বাস্তু' ঘোষণা করে স্বাধীন ও সম্মানজনক অভিবাসনের অধিকার দিতে হবে।

১০. ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ মিথেন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষিখাতকে এ লক্ষ্যমাত্রার বাইরে রাখতে হবে। এবং

১১. শিল্প, পরিষেবা ও বাণিজ্যসহ সকল খাতে সবুজ রূপান্তরের জন্য স্পষ্ট ও বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

অধিকতর তথ্যের জন্য যোগাযোগ

bwged

ফোন : +৮৮ ০২ ৪৭৭৭ ০১৪৫৮ | ইমেইল : bwged.bd@gmail.com
ওয়েবসাইট : https://bwged.org | ব্লগ : https://bwged.blogspot.com